প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক

শ্রীশ দে

সাহিত্য-তীর্থ

৬৭ পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ-পট

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

মুদ্রক

শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস

অক্ষয় প্রেস

২৭।৫, তারক চ্যাটার্জ্জী লেন,

কলকাতা ৬

কাব্য-কাকলি

....

....

....

উৎসর্গ

কল্পনা বৌমণি তব করকমলে,

প্রথম জীবন-জুরে যে সুর দোলে

এ প্রীতির প্রাণ-পাত্র উজাড় করি,

তব লীলা ছন্দময়ী হৃদয় স্মরি ;

মোর কবি-কৈশোরের কাব্য কাকলি

দিলাম তুলি-

দোলপূর্ণিমা

১৩৫৮

রমেন্দ্র নাথ মল্লিক

রচনাকাল

১৩৫৫—১৩৫৮

ফাল্গুন

সূচীচিহ্ন

সূচীচিহ্ন

কবিতা

পদাবলী

কল্পনা কুতূহলী,

রচনা কবির কবিতা-কুজন

সৃষ্টির কৃষ্টি-সৃজন ;

যুগে যুগে

ফল্গু প্রবাহ ধুলা-ধরণীর বুকে

নানা রূপে

চুপে চুপে।

ঘাত প্রতিঘাতে

জীর্ণ করি সাথে সাথে

অগ্রগতি অনর্গল চলে

সৃষ্টি-সৃজন-কলে।

নাই কোন বাধা,

যেথা কবি-কল্পনায় সাধা

জীবনের নবীনতা

সবুজ-সজীবতা

জাগে,

রাগে অনুরাগে।

জানি, সেই মাত্র বেদ-বাণী

শুনে যত পৃথিবীর প্রাণী,

যুগ হতে যুগান্তে আসি,

নানা দেশ বাসী,

মিলেছে সবার চিন্তা-চিত্তে

এ মিলন তীর্থে।

পবিত্র-পূর্ণ আশে

সহস্র সম্ভাবে,

ফলেছে যুগের ফসল যত
শত শত,
উজ্জীবন উর্বরে
মানস-মৃত্তিকার স্তরে।

নিশীথ সাকীর পেয়ালা ঝরা
সুধা রসে সিক্ত করা
কবি-তীর্থ-বারি,
সুসিঞ্চিত রোমাঞ্চিত কবিতারই।
প্রভাতের কাব্য-কাকলি
যেন অস্ফুট গুঞ্জন-অলি।
তমসা-তড়িতে
আজিকে দূরিতে
আসা ধরা-ধরিত্রী বুকে
প্রকাশোন্মুখে।
তাই, তৃষিত মানব মনে
শান্তি সুধা-সুখ বরিষণে
বারংবার
আবির্ভাব,
বিজড়িত মোহিনী-মায়ায়
অভিকল্পিত কবিতায়,
মনন-সৃজন পথে
সৃষ্টির আদি কাল হতে।

পাথুরিয়াঘাটা
১৪ই আশ্বিন ১৩৫৮

আহ্বান

আজি এ নববর্ষে—পয়লা বৈশাখ
এনেছে সাথেতে নূতনের ডাক
নবীন ভারতে এনেছে আজিকে
মিলনের আহ্বান।
তারি আহ্বান দিকে দিকে আজি
উল্লাসে উঠি নব তানে বাজি
জানাক সবারে সোহাগ স্বপ্নে
নর্ম অভিবাদন।
হে ভারত আজি নবীন বর্ষে
গাও সবে মিলে মিলন হর্ষে
নব পবিত্র হিয়ায় স্পর্শে
মিলনীর জয়গান।
নবীন ভারতে এনেছে আজিকে
মিলনের আহ্বান।
আজি আহ্বানে বাজে উৎসব ভেরী
পূজা-উপচারে দাও সবে ঘেরি
নববর্ষের নব উল্লাসে
অর্ঘ্য করিও দান।
শুচি-সম্ভারে সাজাইয়া ডালি
বিগত ব্যথারে দে' জলাঞ্জলি
নববর্ষে বিমলানন্দে—
জাগাইয়া মনপ্রাণ।
জাগুক আজিকে দেহের শক্তি
মোহিনী-মন্ত্রে মনের ভক্তি,
মন্ত্র গভীর তন্ত্রে জাগুক
চির নূতনের তান।
নবীন ভারতে এনেছে আজিকে
মিলনের আহ্বান।
আজি এসো নবাগত নবীন বর্ষ
কর অন্তরে নিবিড়-স্পর্শ,

পুণ্য-স্পর্শে যাত্রা-জীবনে
কর প্রীতির প্রদান।
হে নববর্ষ সজীব নবীন
বাজাও তোমার বিচিত্র বীন,
নববর্ষেতে নবীন হর্ষে
শুনাও তাহার গান।
শুভ সুন্দর এ পুরস্কার
বর্ষে বর্ষে আসা যাওয়ার,
নিত্য নূতন আমেজ আলোকে
এই প্রগতি বিতান।
নবীন ভারতে এনেছে আজিকে
মিলনের আহ্বান।

১২ই চৈত্র ১৩৫৫

নভ রঙিমা

হে দেবী, কি তুলি ধরেছ হাতেতে
এঁকেছ এ নভ পটে,
কত রঙ্ রঙে কত রূপে সাজা
এ কি কভু দেখা ঘটে!
জলে ছল-ভরা মেঘে মোহ-ঘেরা
মাঝে মাঝে ফাঁকা সাদা ঢেউ ওড়া,
কোথা যেন দেখি—পুঞ্জ মেঘমালা
ভূষ-মাখা পূবে বটে।
এঁকেছ এ নভ পটে॥
জল ভারে ভরা মেঘ টলমল
নীল নিখিল গগনে,
নৃত্যেরই ছন্দে হৃদয় আনন্দে
অপরূপা এ ভুবনে।
উদাসী পথেতে তাই মন মোর
চলে বারবার এ মরমে ঘোর,
বাঁশি বাজে সেথা মন ভোলাবার
বর্ষা মুখর লগনে।
নীল-নিখিল গগনে॥

১৩ই বৈশাখ ১৩৫৬

সমীরদূত

দূর সুদূর পীবর প্রান্তলীন ঢাকা
দিগন্তর ধূয়োমান যে কুয়াশাচ্ছন্ন,
তারি দূরান্তে হেথায় কোন পুর-প্রান্তে
দণ্ডায়মান একাকী অনামী এ কবি ;—
সে অনাগত যুগের কুলপতি কবি।
দেখ দেখ নতমনা আঁখি মেলি সবে
এখনও যে পশেনি সকল হিয়ায়
তার ছন্দ-গীতি-সুর সবার সভায়।
আজিকার অযাচিত এই হেন কবি
পূর্ব সান্ধ্য-ক্ষণে বসি গেয়ে যায় গান,
বয়ে যায় সমীরণ,—খণ্ড ছিন্ন মেঘে
আজি আচ্ছন্ন অম্বর। তারি স্মৃতি মাঝে
লয়ে আসে মলয়া রে মৃদু মধু সুর,
জেগে ওঠে কত ছন্দ, কত গাথা-গান
ভরে ওঠে মিলনের সুধা সুরভিতে—
দূর সুদূরের সুপ্ত-পল্লী বাট যত
আর এই অযাচিত কবি হিয়াখানি।

তুমি হে সমীরদূত, লয়ে যাও আজি
প্রাচ্যের মহান বাণী পাশ্চাত্যের ভালে,
উদ্ভাসিয়া তাহাদের জড়-জ্ঞানী মনে
মোর গীতি-মণিহারে নব-কল্পনায় ;
পূর্ব দেশী কবি বলি বিনা অবহেলায়।

হে সমীর দূতি, ওহে মুক্ত সমীরণ !
লয়ে যাও যত মোর আজিকার গান,
সেই অজানা দিনের অনাগত যুগে
রয়ে যাও চিরকাল মানুষের মনে।
শুনাও অগ্রগতির অনাগত যুগে,
গোধূলি আসন্ন আর সেই সে সুদীপ্ত
মধ্যাহ্নের মধ্য দিনে। এই গাথা গান
এই হাসি রাশি আর কল্পনা গাওয়া,
গাহিও হে মধুকর, হে সমীর দূতি।

তোমার মাধুরী মায়া দিয়ে যাক মোর
নামী অনামী দিনের প্রতি ছন্দে গানে
শরৎ বসন্ত বায়ু মোর প্রাণে। আনো
আজিকার কোন গান, কোন কল্পনার
শুভানন্দিত সেদিনে করিয়া নন্দিত।
তারি দ্যুতি সমীরণ—উদয় বার্তার
সঞ্চরণ, পুঞ্জি-প্রায় মেঘান্তর পরে।

তাই ডালি সাজায়েছি আপনার হাতে
সযতনে, গাঁথিয়াছি লিপির মালিকা
থরে বিথরে বরণে কুসুম চয়নে
সৃষ্টি রূপের সৃজনে আপনার রূপে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

মেঘদূত

মেঘমেলা আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
এই মহা-ভারতের শিখরেতে বসে,
সে দিনের কত শত বিরহীর ব্যথা
এই দিনে কবি-কণ্ঠে ছন্দে হলো গাথা।
কল্প-কুঞ্জ বনশীর্ষে দেখা দিল আজি
যুগ-যুগে দূতি রূপে স্বচ্ছ মেঘরাজি।
তারি করে মহাকবি দিল যে বাণীর
আনিতে সে বার্তা যক্ষে বিরহী রাণীর।
সেই দিন মেঘদূত হইল রচিত
নর নয়ন-যুগল করিয়া চকিত,
মন্দাক্রান্তে মুখরিত বরষণ দিনে
আজি শুধু সুর ওঠে বিরহীর বীনে।
প্রিয়া পরানে জাগালো সে ভাব-উচ্ছ্বাস
বিরহেতে ব্যথাতুর কবি কালিদাস।

১লা আষাঢ় ১৩৫৬

প্রাবৃষা

মেঘ মগন রে শ্রাবণ গগন
জল ভরে,
তরী ত্বরা আজি বন্ধ রয়েছে
নদী পরে।
জল ভরে সদা হলো টল-মল
নদী ধারা জলু উচ্ছল ছল,
ঢেউ-এ কূলে চলে দেখি কোলাকুলি
ভর পুরে।
মেঘেতে মগন শ্রাবণ গগন
আজি তোরে।
মুখরা মনেতে চলে হাসা হাসি
তরুণের।
প্রাণন নিভৃতে অতি মেশা মিশি
হৃদয়ের,—
বাসা বেঁধে আছে আশা সব কিছু
দিগন্তে লীন মেঘমালা পিছু
রবির আলোক মেঘের কালোয়
ঢাকা পরে
আছে আজ ওরে শ্রাবণ গগন
জল ভরে।
গগ্নে গগনে শুধু মেশা মিশি
মেঘে মেঘে,
তাই আশা ওঠে আকাশে মানগে
জেগে জেগে।
ঝর্ ঝর্ ঝরে ধারা বরিষণে,
বিজুলি চমকে মেঘ ঘর্ষণে,
কম্পিত ক্ষণে চমকি ওঠে যে
অন্তরে ;
মেঘ মগনরে শ্রাবণ গগন
জল ভরে।

১৭ই শ্রাবণ ১৩৫৬

যেতেই হলো

এবার আমায় যেতেই হলো যে,
নব-যৌবন সভাতে,
আজিকার এই মুচকে হাসির
প্রভাতে।
সেথা সাজা আছে বরণের ডালা,
হাতে আছে তার মল্লিকা মালা,
হাত ছানিতে যে ডাক্‌ছে আমায়
অমল তার শোভাতে ;
আজিকার এই মুচকে হাসির
প্রভাতে।

কণ্ঠ ছাড়িয়া আমি একা আজি
মিলনী গাব গীতিকা,
সপ্ত-স্বরের সুর সুরভিত
বীথিকা।
হাতেতে থাকিবে মিলনের রাখি,
স্মৃতি সম্পদে যত আছে বাকি
বাহিরে পরানে,—মাধুরী মিলন
আসুক আজি সবাতে,
আজিকার এই মুচকে হাসির
প্রভাতে।

উদয়ী-ঊষায় রজনী পোহায়
মায়া মন-মন্দিরে,
চাহি না প্রিয়ারে রাখিতে সেথায়
বন্দিরে।
দেখিতে আঁখি যে শুধু একা চায়,
আল্‌তা রেখার আল্‌পনা পায়,
বধু যাক্‌ চলে মনের গহনে
আমার আঁখি লোভাতে ;
আজিকার এই মুচকে হাসির
প্রভাতে।

আঁখি-অনিমেশ পথ পানে চাহি
আমার একা কুঠিরে
মিলন দেখি যে মেঘে নীলিমায়
দুটিরে।
খেলিছে আপনি মন-ভোলা কালো,
তেমনি করে কি মোর বাসা ভালো
আমার প্রাণেতে পরান-পাপিয়া
সে কি বিকাশে আভাতে!
আজিকার এই মুচকে হাসির
প্রভাতে।

তবু দেখি আজি যেতে হয় বুঝি
অধরার সে সভাতে,
কি ভৈরবী গান গেয়ে দেবো আজি
প্রভাতে!
যে দুটি আঁখির কোণে কোণে মেশে;
প্রাণের প্রেমিক দোঁহা অবশেষে,
এবার আমাকে যেতেই হলো সে
নব-যৌবন সভাতে
আজিকার এই মুচকে হাসির
প্রভাতে।

২১শে শ্রাবণ ১৩৫৬

গোধূলি

মন উড়ে যায় তট তীর্থে
সূর্যি চলে পাটে।
উড়নি পাখিরা যে দলে দলে
ফিরছে তাদের গাছের তলে;
এখন পড়ুয়া ছেলের দলে
মন লাগে না পাঠে,
তাই চেয়ে থাকে আপন মনে
পশ্চিমের ঘাটে।

রক্ত রাগেতে আভাস ছোটে
মেঘের কোলে কোলে,
নীলাকাশ জুড়ে রঙ্ ধরেছে,
নব নব রূপে শাড়ী পড়েছে,
দেখে যে সবার মন-উদাসী
সুদূরে যায় চলে ;
মিতালী-মনন বাগ-মানে-না
আপন তালে দোলে।

গোধূলি লগ্নে উদাস গানে
সুর জাগে ইমনে।
গোকুলের মধু মনেতে জাগে,
কুঞ্জে প্রাণনে পাখিরা ডাকে,
পিউ-পাপিয়া যে প্রিয়ারে মাগে—
আনচানিয়া মনে ;
গান জাগে আজ মধুরতর
তান ভাজি ইমনে।
মন্দ ম্লানিমা রশ্মি-রূপ
লেগেছে মাঠে ঘাটে,
স্বপ্নপুরের দুয়ার খুলে,
মাঠের পারেতে নদীর কূলে,
কবি কভু গীতি যায় না ভুলে—
ছন্দ-হিয়া বাটে ;
যবে ঘন ঘোর আঁধার নামে
সূর্যি গেলে পাটে।

কাশ পলাশের ওপার হতে
সন্ধ্যা নামে মাঠে।
চাষী চাষ পথে লাঙ্ল কাঁধে
ফিরছে ঘরেতে বলদ সাথে,
ত্রস্ত প্রাণনে পথিক পথে
চলেছে নিজ বাটে ;
তরী ত্বরা মাঝি বন্ধ করে
আধারি ঘাটে ঘাটে।

গো ধুলি উড়ায়ে সন্ধ্যা সনে
ফিরে আপন বাটে,
তাইতো বলেছে—গোধুলি—ক্ষণ
ধুলি ধুসরি মাঠে।

১২ই ভাদ্র ১৩৫৬

বনফুল

কত বনফুল ফুটে ঝরে যায়
কেবা রাখে পরিচয়,
সুরভি শোভনে বিকশি উঠিয়া
আপনা আপনি রয়।
মানবের মাঝে প্রীতি নাই রাজে
থাকে আপনার ঘরে,
কেউ যে বোঝে না কেউ যে জানে না
শুধু কানাকানি করে।
নীল নভতলে পড়লে পরে সে
ঘূর্ণি-পাকচক্রে বয়।
কেবা রাখে পরিচয়॥
চির অজানা সে জীবন সমাজে
সব মানুষের মনে,
মেলামেশার যে পরিচিত পথ
বন্ধ হে তাহার সনে;
ঠাই মেলে না সে, গেছে যেথা ভাসে
দুই তীরেরই মাঝে—
ভাসে অথৈ জলে, হতাশ্বাসে বলে
—অজানা তেজ্য সমাজে।
অজানা যা গায় আপন মননে
ভুল যা নয় তা হয়
কেবা রাখে পরিচয়॥

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

আর্তের সেবা

দুঃখ জর্জ্জড়িত জরা প্রপীড়িত
আজি এ মানব জাতি
শীর্ণ ও কাতর শীতেতে পাথর,
এমনি যায় যে রাতি।
জীর্ণ-মলিময় তাদের সে বেশ,
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ প্রায় শেষ,
এই আজিকার সোনার স্বদেশ
তাই কী আনন্দে মাতি
আমরা বলি যে বিশ্ব মাঝারের
আমরা প্রাচীন জাতি!
যদিও ছিল গো এমনি সেদিন
প্রাণের আনন্দ রাজি।
আজি চেয়ে দেখ কাঙালের বাস
রাজ পথের মাঝ-ই;
ছিল না সেদিন এমনি কো ধারা,
প্রাচীন মনিষী বুঝেছিল তাঁরা—
মানুষের মাঝে নর-নারায়ণ
মানুষের রূপ সাজি,
আর্ত-জনসেবা করে গেছে তাঁরা
নহ গো সে ব্রত আজি

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

শান্তি সমীর

শান্তি সমীর যাক বয়ে যাক
এই ধরণীর বুকে,
বিশ্বজনেরে আপন করিয়া
থাকুক সবাই সুখে।
নিপীড়িত জন ক্রন্দন রোল ওঠে না যেন কো কভু,
জীবন ভরান হিংসা দ্বন্দ্বে ভগ্ন হৃদয় তবু
আজি আনন্দ মুখরিত হোক—অমৃতবাণী বাতে
বিশ্বজনের মুখে;

শান্তি সমীর দূর করুক সে
ক্লান্তি সবার বুকে।
সুখ-শান্তির প্রীতির পৃথিবী
হিংসায় গেছে ভরে
মদিরা-মত্ত মানব পরান
দহে যে আপন করে।
মানুষের মাঝে শুধু যে বিরাজে যত বিভেদ দ্বন্দ্ব
জীবনের গতি বিভিন্ন মতি নাইকো ছবি-ছন্দ
সেথা স্বার্থের দাবানল জ্বলে মহাভীম ভীতিময়
ক্ষুদিত পাষাণ বুকে,
এ বিশ্ব হোক সুশান্তিময়ী
এ হিংসা যত চুকে।
হেথা ধনী আর নির্ধনীতে
থাকবে নাকো বিভেদ
শুনবে সকল মানুষ ধরায়
জগৎ জনে অভেদ।
সব মানুষের অন্তরলীন জাগি নর নারায়ণ
এই মন হোক অমৃত-তীর্থে সুশান্তি পরায়ণ,
অশেষ কর্ম অফুরান গীতি সার্থক আজি হোক
এই ধরণীর সুখে,
বহুক শান্তি অহিংস বাণী
প্রীতির পৃথিবী বুকে।

১৪ই মাঘ ১৩৫৬

উত্তিষ্ঠত

উঠ্‌তে হবে যে আগে গো আমায় উঠ্‌তে হবে,
ভোরের পাখির গান যে আমায় শুনতে হবে।
মাতবে পৃথিবী ভোরের গানেতে,
উঠ্‌বে সবাই উদয়ী তানেতে,
রূপের রাগিণী সুর-সমারোহে
অরুণ-উদয় ঘটছে যবে।
এই ব্রহ্মক্ষণেই পূজার ডালি যে সাজায় সবে
উঠ্‌তে হবে॥

যাহা কিছু চাই নাই যদি পাই দুখ কিসের
যদি যাই পেয়ে মাধুরী-ভোরের এ বাতাসের।
তখন আবার দুখের সে কি রে?
নাচবে সবাই প্রভাতেরে ঘিরে
তাইতো জাগিছে স্বপ্ন শতেক
মাতিয়ে মনের সুমানুষের।
সদা যে প্রতিক্ষাতে—সুদিন দ্বারেতে আসবে যবে,
উঠ্‌তে হবে॥
সুদিন আসবে দ্বারে বলে তাই প্রতিক্ষায়
উদয়ী-উষার অরুণীমা রাগ সূর্যিছায়।
আলোকে তাহার যে অনর্গল
বিশ্ববিজয়ী চলি শতদল,
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত জীবনে
প্রভাতী পথের সু-দীক্ষায়।
আজি বিফলতা দূরী সুদিন সোপান গড়তে হবে
উঠ্‌তে হবে॥

১৮ই মাঘ ১৩৫৬

মিলনী

নীতি নীতি মিল একই যে রীতি
চলি ফিরি নদী তীরে
জেগেছিল দেখি মোর প্রাণে প্রীতি
অচেনা যে অতিথিরে।
পূবের ঘাটেতে ছিনু একা যবে
আরতো ছিলনা কেউ
সূর্যি তখন অস্তা চলে যে—
জলে উঠ্‌তেছিল ঢেউ।
দৃষ্টি আমার যায়নি তখন
মোটেই সেদিক পানে
কণ্ঠে তখন গানটি ধরেছি
সুর সে ইমন তানে।

গানের আমেজে রূপ রূপায়ণে
করছে মন হরণ,
রক্ত রাঙা যে সকল সাজেরে
করলে সে কি বরণ !
ঐ দূর সুদূরে আঁচলখানি যে
সিঁথির সীমানে রেখে
অচিনপুরের বধুয়া যেন সে
বলি আজি তীরে দেখে।
শয্যা-সায়মে নাম লবে মুখে
প্রেমিকে সন্ধ্যারাণী
আমার কাছেতে আজও যে তাই
বাহিছে একই বাণী।
এ নিশিদিনের এমনি করেই
মিলনী সে প্রিয়া সাথে
ক্ষণেক পরেতে চুম্বন-চূরে
ক্লান্তি নামিছে মাথে।
হৃদয় মধুর মোহিনী মায়ায়
দোদুল মৃদু সমীরে ;
ক্লান্তি ঘুচাতে নামিছে শান্তি
কল্পনা ভূমা তীরে

২রা ফাল্গুন ১৩৫৬

চপলাবতীর উক্তি

পথে যেতে যেতে মনে পড়ে কি গো
একদিন ফাল্গুন শেষে
শব্দহীন মধ্যাহ্ন বেলা ;
যেতে ছিলে একা
তুমি আনমনা ;
গান গেয়ে আর নাম না-জেনে
আমার জানালা পাশে।
আমি ছিনু একা জানালার ধারে
আর ছিল কেউ মনে পড়ে নাকো

তবে প্রাণে ছিলে তুমি
আপনার আসন পাতি।
অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে বারেক চেয়েছিলে তুমি
আজ মনে পড়ে কি তা?

তার পর মনে পড়ে
এর-ও আগে
হ্যাঁ—হ্যাঁ—
তুমিই গিয়েছিলে একা
এই রাঙা-পথ ধরে
প্রভাতের অরুণ রাগে।
সেদিন চিনিনি তোমায়—
চিনে রাখিনি তোমার পথ চলা
আজ তারই কি গো অনুরাগ!

যে দিন বৈশাখী ঝড়
ফিরে গেল ধরণীর বুকে এসে,
চলে গেল নতুন পৃথিবীর আশ্বাসে
শূন্য করি মানব-মানস।
সে দিনও আমি
ডেকেছি তোমায় জানে অন্তর্যামী।
ঝড়ের মাঝেও ভুলে যাইনিকো,
হাল ছেড়ে আমি পাল তুলিনি গে
উজান সাগরের বুকে
ভাসাইনি তরী খান।
বেয়ে চলিয়াছি ধেয়ে—
ব্যাকুল আকুল পরানেরে টেনে,
বহু দিন বহু রাত ধরে
বাঁধিতে চেয়েছি বাহু ডোরে
পারিনা,—পারিনা তবু!
পদ্ম-দিঘল-দিঘির কূল হতে
চেয়েছি তুলিতে রাঙা পদ্মমৃণা
তবু বারংবার
সে গেছে দূরে বহু দূরে সরে

বর্ষণ শেষে
শরতের শুভ্র-স্নিগ্ধ মাসে
গান শুধু মোর চরণ-চুমেছে,
প্রাণতো তবু পায়নি পরশ
মনের মতন করে
আপন গৃহ কোণে।
তাই এমনি দিনে ভোরের হাওয়ায়
তোমার মধু-ছন্দ গান ;
আমার হল স্মৃতির মালা
তোমারই প্রীতির ডালা জেনো।

যদি নাই বা লাগে ভাল
আঁখির পাতা করা ভারি ভারি,
তবে ভাসিয়ে দিও উজান জলে
তব প্রীতির জোয়ারেতে।
নাই বা হনু মানস-তাপস
তবু তোমার যে গো সবাই তাপস,
তপ্ততা মোর স্তব্ধ হবে,
ব্যাকুল বাসনা সফল স্বপ্নের
স্নেহের সাথে যদি হৃদয় মাঝে
আসন লভি সহজ সাজে।

কবির অভিব্যক্তি

মানব মানসের শাশ্বত আশা
মনে প্রাণে ভালবাসা,
ক্ষয় নেই ভয় নেই
নেই তাতে কোন বাচালতা নেই ;
চপলাবতী !
কেন হও ব্যাকুল অতি ?
প্রাণ চায় যারে
মন তারই পথ ধারে
আছে প্রতীক্ষিয়া।

তবে তুমি কি গো সেই প্রিয়া,
যার তরে এতদিন ধরি
রচিয়াছি স্বপ্নের সুধা-মাধুরী
লিপি গুচ্ছে কল্পনার আলিম্পনে
রাঙা রসে অভিষিক্ত করি ভূমার ভুবনে।
কেটে গেছে কত বর্ষা বসন্ত,
করেছে প্রাণের বিশ্বে বিষণ্ণ।
তবে কি আজি এসেছে বসন্ত মধুর
অথবা শৈতালির অতি নিঠুর ?
তবুও যখন করেছ স্মরণ
উপায় রাখনি না করে বরণ।
প্রভাতী পূজার ফুল হয়ে থাকো,
ঘুম ভাঙানোর ভোরবেলাকার
গান রূপে থাকো,
চুপে চুপে সারা জীবনতন্ত্রে
স্বপ্ন জালের এসো মধুর মায়াবী মন্ত্রে।

বৈশাখ ১৩৫৭

লিপি

যুগ যুগান্তের পর্য্যাপ্ত কাহিনী
লিপির লিখনে রহে জাগরিত
মানুষের মনে,
ভোলে না ভোলে না তাহা কোন দিন
বিস্মৃতির সনে।
সে লয়ে যায় যে দূতি রূপে বাণী
কালে ও কালান্তে
অবসান করি বিস্মৃতির খেলা
ভাবে ও ভাবান্তে।
যাহা কিছু আছে ভালো আর মন্দে
সব একসাথে গাঁথা হয়ে ছন্দে
ভরি লয় ঝুলি,
স্মৃতি পটে আঁকা তারি রূপে রঙে
রূপদানে তুলি।

জন যায় মরে যায় সব চলে
রহে তুলি-লিপি
সে লিখন নহে কালের নহে তো
সে যে চিরঞ্জীবি।

আজি তাই ভুলি হিংসা কুটিলতা,
লপির আঁচড়ে সচ্ছ সলিলতা
রূপ ধর আজি ;
মদমত্তা ভুলে সৃষ্টির শান্তির
সাজাইবে সাজি।
মাটির সোঁদেল গন্ধ ধারা বহি
আনুক আঘ্রাণে ;
আগামী কালের ফসল ফলাক
পুলকে পরানে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

আষাঢ়ে

বিহান হলো, দোর দুটো কে খুলে
ত্রস্ত পথে আসে পূবের দিকে
সূর্যি তখন, দূরে তমাল মূলে
ছিড়িয়ে ছিল হাসিটি তার ফিকে।
এলিয়ে দিয়ে রঙিন চেলিখান,
হংস মিথুন কেবল ভাসমান,
আরতো কিছু পড়েনি চোখে তার
রঙিন আলো সবে ধরল দিকে
তখন কবি সুপ্তি ছেড়ে উঠে
ত্রস্ত পথে আসে পূবের দিকে।
ওপার হতে ভেসেই এলো গান
বিহান বলে ধরলো ভৈরো তান,
কেউতো কার শুনছে না কো কথা
আপন মনে চলছে কবি তাই
ভাবছে না কো কারই ফেলা কথা
জাগছে মনে কত কী হতাশাই।

তখন দেখে জগৎ মাঝে সবে
জেগেছে তারা সুপ্তি ছেড়ে দিয়ে
রঙিন হাসি যত দেখার আশ
থাকছে পড়ে চলে কর্ম নিয়ে।
যে যার পথে ব্যস্ত বাগিস-এ
চেয়ে দেখার কই সময় রয়ে
আজকে সে যে ঊর্ধ্বশ্বাসে বয়ে
চলছে দ্রুত ভিড়ে হাস ফাসিয়ে ;
বিহানে কবি থাকে আপন মনে
যখন তারা ব্যস্ত কাজ নিয়ে।
কবির সেটা লাগছে না কো ভালো
হিয়ার মাঝে একটি জ্বালা আলো
বিহান হতে সে হয়ে আছে কালো,
সবার মাঝে যখন নাই নাই,
কবির হিয়া অচিনপুরে পেলো
সে আভাসেতে সকল পাই পাই।
তখন দেখি নদীর ওপারেতে
নেমেছে একা কালো কাজল মেয়ে,
ফুরিয়ে এলো বিহানের ঐ হাসি
এলিয়ে দিলে কেশ সজল পেয়ে।
তখন কবি একাই এপারেতে
বসেই থাকে ধরার ওপরেতে
মনের কথা জেনে শুনে কবির,
বসন খানি বক্ষে চেপে মেয়ে ,
উঠ্‌তেছিল আঁখিরপাতা করি
যে ভারি ভারি—সজল হতে নেয়ে।
কবি-বক্ষ বড়-ই দুরু দুরু
উঠ্‌তেছিল রব যে গুরু গুরু,
তখন সেথা আর ছিল না কেউ
কবি এপারে মেয়েটি পর পর,
আসতেছিল কাঁদুনি ভেউ ভেউ
সজল ধারা নামলো ঝর ঝর।

৩১শে আষাঢ় ১৩৫৭

কেন মিছে

কেন মিছে
পড়ে থাকা সকলের পিছে!
পশ্চাৎ সে কি শুধু পশ্চাতে—
চায় না কি সে ফিরে যেতে সবার সম্মুখে?
কয় না কি অসীমের কথা
গোপন অন্তরে লুকায়ে সকল ব্যথা,
তার ব্যাকুল হৃদয়ের মাঝে
স্থান লভেনি কি একা সে!
চায়নি কি উড়ে যেতে উর্ধ্বাকাশে
দূর দূরান্তের বনানীর পারে,—
একটি শুধু বাণী লয়ে সাথে
সে যে আজ মানুষেরই স্তরে।
স্তরে স্তরে পড়েছিল যে আকীর্ণ
ধূলায় ধূসরিত স্তূপশ্রেনী অন্তরালে,
যার ফলে শুধু কেঁদেছিল কবি
আর শিল্পী এঁকেছিল স্বপ্নের ছবি।
সে স্বপ্নীল আবেশ মাঝে
জেগেছে বারেক কবির হৃদয়
চেতন অচেতনে হয়েছে যেথা মিল
সেই আকাশের নীলে হবে যে নিলয়।
কেন তবু পড়ে থাকা সকলের নীচে
সকলের পিছে;—সব জানাদের পশ্চাতে

৫ই শ্রাবণ ১৩৫৭

আঁধারি

আঁধারের ক্রোড়ে
আঁধারের প্রাণী যত থাকিবে কি পড়ে,
নিশিদিন
একই পথ ধরি রবে, হবে না ক্রান্তির সম্মুখীন!

বাজাবে না প্রলয় বিষাণ,
উড়াবে না বিজয় নিশান
কালের করাল কবল হতে দূরে ;—
যাবে না আপন পুরে !

ভালবাসা
প্রাণে প্রাণে জনে জনে এই ছিল শুধু আশা
—সে দিনের সেই
প্রভাতীর দিনে ;—আজ মিলনী-চিহ্ন নেই
শুধু পড়ে আছে নরদেহী মানবের শ্মশান শয্যা
হিংসার মহাবিষ করেছে পাষাণ সবার মজ্জা,—
যে বিষ প্রবেশে প্রাণনে পিঞ্জরে
আঁধার এনেছে অন্তরে।
অবগুণ্ঠনে ঢাকা
এ আঁধার কুয়াশা খুলে ফেলে থাকা
চাই আজ চাই
ভয় কোথায় কাজল মেঘের চিহ্ন নাই নাই।
ঝড়ে যদি করে লুণ্ঠিত,
আছে যে বৃক্ষ দণ্ডিত—
ছুতে চায় আকাশেরে মহা-উল্লাসে
তপ্ত মনের আশ্বাসে।
প্রভাতে আলো চক্ষু ঝলসাবে জানি
তবু জাগো আঁধারের প্রাণী।
চেয়ে দেখ
প্রভাতের রক্তিমাভা দূর করে আঁধারি মেঘ,
ঐ দূরে দূরে
পাষাণ পিঞ্জর ভেদী জাগুক ভৈরবী সুরে
জাগরণের মহা আশ্বাস বাণী,
সর্বব্যাপী সুপ্তি হারা নর প্রাণী
সভ্যতা নামি জড়ত্ব-জীবনে জয়ী
এসো কল্যাণময়ী।

২৬শে আশ্বিন ১৩৫৭

ক্ষুদে সৈনিকের দল

ক্ষুদে সৈনিকের দল
চয়ন করে আনে
জগতের কত বিস্ময় সম্ভার।
কত মানুষের অপরিচিত
চিরদিনের অবহেলিত
তারেই এনেছে বহি বারংবার,—
সৃষ্টির নবীন তুলিকার
নব নব রঙিন ছোঁয়াচে
অবাক লেগেছে সে সব
সোনালী শৈশবের চোখে।
তাই সৃষ্টির নব রহস্য
উদ্ঘাটন,—
ক্ষুদে সেনানীর হল সম্ভার।
রূপ-রঙের রঙিন আবেশ
রাঙিয়ে তুলেছে মনে
সৃষ্টির ক্ষুদে সৈনিকের দল,
তারা রচনা করেছে নতুন জগৎ
রূপকথার স্বপ্নপরীতে ঘেরা
নীলে আর লালে বিকশিত শতদল।
অন্তবিহীন কল্পনা-তরী
শিশু কোমল মানস লোক,—
অভিযান তার দূরদেশে
সকল বাধা অতিক্রমের ;
সৃষ্টি করবে এমনি করে নতুন জগৎ
কল্পনার রাঙা-রসে অভিষিক্ত
ক্ষুদে সৈনিকের দল।

২৬শে আশ্বিন ১৩৫৭

ফুকো সভ্যতার শিক্ষা

গৃধ্নু-গৃধিনীর দল,
বাসা বেঁধেছে মানস-মন্দিরে
রুদ্ধ করেছে মনুষ্যত্বের-সিংহদ্বার।
তাই আজ নরদেহী পশুদের
লাস্য-লীলা চোখে পড়ে,—
দেখি দানবতার অভ্যুদয়।
কোথা সেই নিষ্কলঙ্ক প্রেমের ইশারা
কোথায় মিলন-তীর্থ রচনা হলো
হলো কই মহামানবতার বিকাশ।
তবে কি কবির স্বপ্ন-সাধনা
ব্যর্থ হলো--ব্যর্থ হলো আজ,
সফলতার কোন ক্ষেত্র নেই;
নেই কি তা'হলে মানবতার ভাগ্যে লেখা
মুক্তির তীর্থ-সলিলে অবগাহন!
সাগর-মন উচ্ছলতার ঢেউ তুলে
বারংবার
কামনা করবে পশু পাখির
আর তাই ভেবে কবির
হৃদয়-যন্ত্রগুলো বন্ধ হয়ে আসে।
শোনা যায় অমংগল ধ্বনি
ধ্বনিত হয়ে ওঠে
ওঠে দুষমনের ব্যভিচারে
দেশ জোড়া আর্ত্তের আর্ত্তনাদ।
নিপীড়িত প্রপীড়িত দুর্বলের দল
অত্যাচারীর লৌহ-হস্তের চাপে
দলিত—নিষ্পেষিত।
স্থান নেই মান নেই তাদের
যারা হলো ক্ষীণ দীন পতিত
আমাদের সভ্য-ভব্য সমাজের চোখে।
কই তাদের ডেকেছি কাছে,
বসিয়েছি আমাদেরই পাশে,

জিজ্ঞাসা করে জেনেছি তাদের
সরল ব্যথিত উন্মুখ প্রাণের
দুটো কথা।
শুধু বাজায়েছি এতদিন ধরে
ফুকো সভ্যতার শিঙা।

২৭শে ফাল্গুন ১৩৫৭

যাত্রা পথে

ভালো লাগা না লাগা,
এও বুঝি দুয়ে মিলে হয়ে গেছে এক ভাগা—
অগ্রগতির পথে ফিরায়েছে ফল্গু নদীর বাঁক্
ক্রান্তি রেখায় আজ মৃত্তিকার রেখা পাত্॥
ভালো আর মন্দ,
সব যেন্ এক হয়ে ধারণ করেছে নীলকণ্ঠ ;
বিষে আজ মিশে হয়েছে ভৈরবী প্রেতাত্মা,—
তাণ্ডব-নৃত্য প্রলয় রাগিণীতে মন-মত্তা॥
কণ্টকময় পথে,
ঠেকা খেতে খেতে এসে যাত্রা পথের প্রান্তে
গুমড়ে গুমড়ে তাই উঠে ফুকে—বজ্রুৎপাত যত,
ভিসুভিয়াস্-ইরাপ্সান অথবা কাল-নাগিনীর মত॥

২৮শে আশ্বিন ১৩৫৫

প্রভাতে ও সন্ধ্যায়

প্রেমে ক্ষেমে জীবনের প্রেতায়িত রূপ
ধূমায়িত হয়ে ওঠে ভাস্কর জগতে,
হেমন্তের শিশিরে ভেজা
প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।
হৃদয় মন্থন করি যে বিষ
উঠেছে ধরায়
তারই চাক বাঁধে নীলাভায়
প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

ব্যর্থ জীবনের যোন আশা
আর পশ্চাতে ফেলে আসা
দিনগুলো বারে বারে
নাড়া দেয় হৃদয় পারাবারে।
মনে হয় বুঝি যুগান্তরে
হয়ে গেছে তাদের সবার স্বয়ম্বরা
বাকি আছে কিছু অন্তরে
বাহ্য দৃষ্টি লোকের আড়ম্বরা।
তাই বুঝি হিংসার করাল মূর্ত্তি নিয়ে
লাস্য-লীলা প্রেমে আর ক্ষেমে ;
উঠা নামার অন্তরায়
প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

১লা কার্ত্তিক ১৩৫৭

অন্ত নাই কো নাই

অজুত লক্ষ বার
যেতে হবে অজস্র পথে,
অজানার অনুসন্ধানে
অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে।
ফিরে যাওয়ার উপায় যে নেই
এখন শুধু চলা—
এগিয়ে চলা।
পথে যেতে যেতে মনে হবে
আর কত দূর……
পথের শেষ কোথায় ?
মিলবে শুধু একটি উত্তর
—শেষ নেই……
ক্রান্তি ধরে
অসীমের উদ্দেশে
এ অনন্ত যাত্রা।

১১ই কার্ত্তিক ১৩৫৭

অলেখা নীতি

নীতি ক্রান্তি ধরে
যেতে যেতে মনে হতে পারে
জীবনের এই কটি তবে কি
গাথা কথা আর নেই বাকি ?
শুধু ওপার হতে এসে ওপারে যাওয়া
আর আসা,—
বারংবার
প্রতিদান ধরণীর হাসি খেলায় !
বেদ মন্ত্রে পুরাণ উপনিষদে
অনেক নীতি কথা লেখা থাকতে পারে
কিন্তু এ ছাড়াও আছে
অনেক অলিখিত নীতি।
লেখার রেখায় আবদ্ধ থাকবে সে
একথা ভাবাই যে অভাবুকের,
সে সব কথা থাকে মনের পটে
পৌরুষে আর মহত্বে।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৫৭

পথের দুধারে

পথের দুধারে কি বা আছে পড়ে
দেখি কি চোখ চেয়ে—
চলেছি শুধুই যতেক চড়াই
ও উৎরাই বেয়ে !
ধুলো-ধোঁয়ারই আকীর্ণ পথে,
সৃষ্টির কোন শতাব্দী-রথে
শুধু বাঞ্ছিত মন নিয়ে চলে
লাঞ্ছিত করেছি ;
এ দেশ কালের আর যাত্রীর
আশংকা এনেছি।

স্রোতের দুধারে পড়েছে পেলব
পেলল পলি-মাটি,
ফুলে আর ফলে শস্যে ও বীজে
জানি ভরেছে ঘাটি !
ব্যস্ত-পথিক পথেরই শেষে
রত্ন মাণিক খুঁজেছি যে এসে
কোথায় পাব গো এসেছি ছেড়ে যে
তীরের কোন দেশে
হতেই হবে যে নিঃস্ব সবারে
পথেরই সু-শেষে ।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৫৭

সর্বগ্রাসী

তোমার আসা, সর্বগ্রাসী,
জীবনের রক্তিমাভায়
মৃত্যুর করাল ছায়া হানি
তাণ্ডবের রুদ্র মূর্ত্তি নিয়ে ।
গোধূলি ঘনায়ে আসে
জীবনের উদয় বেলা
শেষ শ্বাস উঠে
আঁধারে বিলীন হয়ে যায়
অপরিপূর্ণতায় ।

দুর্বিসহ,
ওগো ভীষণ ভীমা,
হাসি ও আনন্দে
ব্যস্ত যাত্রী দলে
ত্রস্ত কর ;
জীবন-যৌবন
ধন-মান
সব গ্রাসী
তবু আশা মেটে নাকো
ওগো সর্বগ্রাসী সংগ্রাম ।

চাও তুমি আরো চাও,
যত পাও তত চাও
মেটে না ক্ষুধার জ্বালা,
শেষ নেই দহনের ক্রিয়া
চলে অনর্গল চলে ;
দেশ কাল সর্বগ্রাসী
তোমার লাস্য লীলা।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে
পড়েছে মৃত্যুর রজ্জু
সারে সারে, —
যৌবনের মধু-মাধুরী নিয়ে,
তোমার শিষ্য-সৈনিক যত।
শেষ করে দাও তুমি
তাদের শত আকাঙ্খিত আশা
জীবনের প্রেম ক্ষেম যত !
কি চেয়েছে জীবন,
কি পেয়েছে প্রাণ মন,
সে কথা ভাবার কি
সময়টুকু নেই !
শুধু জ্বালামুখ নিয়ে আসা
সর্বগ্রাস তরে !

অর্থলোভী পিশাচ রূপী
জয়োদ্ধত রক্ত লোলুপ
স্বার্থসিদ্ধির দলে,
তুমি কর কাল জয়ী।
তারা পদচিহ্ন রচনা করে
মানুষেরই শিরে শিরে।
তারাতো তোমার ক্রীড়নক
তুমিতো নও,—
ছাড় ছাড় আজ তুমি
তোমার সর্বগ্রাসী রূপ।

২০ কার্ত্তিক ১৩৫৭

আকাশ মাটি

এই পৃথিবীর রূপে ও রঙে
মুখর করা যে আকাশ মাটি,
বিচিত্র তাহার ধুসর ঢঙে
নীলের মাঝারে মেঘের ঘাটি।
আকাশ বাণী যে বহন করে
আসছে মেঘেতে দূরের দেশে
পবিত্রতারই যে স্পর্শ তরে
হিংসা কুটিল এ মাটির শেষে।
বর্ষণ ধারায় ভিজিয়ে দিয়ে,
এ তপ্ত ধরার ধুসর মাটি,
নীলের রেখাই ফুটিয়ে তোলে,
আকাশে তাহার বিচিত্র পাটি।
আকাশ মাটিকে মেলাতে হবে
মানুষেরা মিলে পাহাড় গড়ে—
দ্বিগুণ তেজের কি শক্তি-স্রোতে
একদিন এক অজানা ভোরে।

২৩শে কার্ত্তিক ১৩৫৭

নিরালা

দূরে বহুদূরে কোলাহল হতে
ছায়া বীথি ঘন চল নিরালায়,
শাসন পেষণ এ যাতনা মুক্ত
বাঁধন হারান খোলা হাওয়ায়।
যেথানে এখনো ওঠেনি কো ভরে
ক্রন্দন কল্লোল আজি হাহাকারে,
বুকের পাঁজরা যায়নি কো পুরে
জমাট বাধা রে ব্যর্থ-বিষোদ্‌গারে

নালা-নালী পথে এখনো যেখানে
মানুষের হাড়ে যায়নি কো বুজে
শকুন দলের নিত্য লাস্য-লীলা
চোখের তারারা পাবে না তো খুজে
প্রেম ক্ষেম যেথা এখনো বিরাজে
নিয়ত নির্জনে সত্য শিব কাজে।

-২৪শে কার্ত্তিক ১৩৫৭

শীতে

শীতে থর্‌থর্‌—আজি ঝর্‌ ঝর্‌
কাঁপন লাগে সবুজ ঘাসে
আর গাছে যে পাতায় মিশে
ধ্বনি উঠে শুধু মর্ম্মর।
অন্তরে আর যে বাহিরে
সুমানুষের সবশরীরে
শিহরণ আজি উঠ্‌ছে জেগে,—
এলো মেলো হিম্‌ বাতাশের
ঝপ্‌টার দুচার চড় চাপড়ের
জীর্ণ গাত্রে আঘাত লেগে।
নীল হয়ে আসা ঠোটে
কেঁপে কেঁপে আজি ওঠে,
ভাঙা অন্তর ফেটে পড়ে
তাজা রক্তের রাঙা-স্রোতে।
ওষ্ঠ প্রান্ত চায় মিলিতে
উভয় আজি শীর্ণ-শীতে।

ভাঙন ধরা লাঙ্গল তুলে
ধরবে আজকে এমন তাগত্‌
আছে কোথা কোন সে চুলে,
আসবে আগে উপেক্ষিতে,
ছেড়া পালটি তুলে দিয়ে
উজান বুকে প্রাণ বিলিয়ে।

শরীরের ঐ সেগুন মত
অস্থিগুলোয় ধরেছে ঘুণ
দহন জ্বালা সইবে সে কত,
গন্‌গনে লাল খেপা আগুন
জ্বলেছে আজ বুকে যখন ;
বায় বাতাসে কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্।
পশমের বেশ পড়বে কিরে
দৈন্যের জ্বালা দিচ্ছে ফুঁড়ে
সে সকল আজ ছেঁড়াছিড়ে
পাওয়া যেতো ডাস্‌বিন খুঁড়ে

এখন তাহলে কাঁপা হি হি
উপায় যখন আর তো নাহি।
আগুন জল্‌ছে পেটটি ফাঁপা
মিটতে পারে পারুক কাঁপা !

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

বাঁশরি পল্লী

দূর সুদূরের আকাশের নীল মাটিতে মিল যে নিল
একদা সেথায় অজানা সবার বাঁশরি পল্লী ছিল।
সাঁঝের আঁধারে বাঁশরি বিতান বাজিত অমোঘ সুরে
আঁধার রমণী অরূপ রূপেতে কিরণ ছড়াতো দূরে।
আজিকে তাহারি ইতিকথা তবে সবারে শোনাই শোন,
একদা সেথায় গাঁয়েতে ছিল যে বাঁশরি বালিকা কোন।
নামটি তাহার মিছে নয় কভু বাঁশিটি বাজাতো বলে
পল্লী বাসীরা নাম দিল তারে সে হতে আসিছে চলে।
যখনি আঁধার ঘনায়েছে ধীরে বাঁশরি ধরেছে তান
নীরব নিশীথ আঁধার পল্লী উল্লাসে গায় গান।
সে গান শুনিতে হইলে আজিকে ফিরে যেতে হয় গায়ে
যেথায় বাশরি বাজাতো বাঁশিটি—বাশ বনে রাখি বায়ে।
দক্ষিণ পথে রয়েছে সাঁকোটি তাহারে ছাড়ায়ে আরো
দক্ষিণ, বামে দুধারে পড়িবে মেটো পথ হাত বারো ;
বাম পথ ধরি কিছু দূর গেলে মিলিবে আরেক পথ
সে পথ গিয়েছে আলোতে মিলায়ে ধান ক্ষেত মাঝে পথ।

দূর হতে তুমি দেখিবে আজও চোখ যদি যাও মেলি,
নিবিড় বনানী নীলিমার মেলা ধান ক্ষেত আগে ফেলি।
কিন্তু সে দিন ছিল না এমন বনরাজি নীল মাটি
ছিল যে সাজানো বধূ ও স্বামীতে কল্যাণে ভরা বাটি।
পল্লী দেউলে আরতি ঘণ্টা ওঠে সন্ধ্যায় বাজি
পল্লীর যত বধূ ও বালিকা আসে অঙ্গনে সাজি,
নব নব রূপ হৃদয় কমলে একটি প্রদীপ জ্বালি
আসিয়াছে আজ যত পূজারিনী লইয়া অর্ঘ্য থালি।
কীর্ত্তন আর বাউলের গানে পল্লী হৃদয় ভরি
তখনি বাশরি বাজাতো বাঁশিটি একটানা সুর ধরি।
এমন দিনের ষোড়শোপচার সন্ধ্যা তারায় নয়
বিহান হইতে বালিকা হৃদয় পল্লী করিত জয়।
পল্লীবাসীর আহার ক্রিয়াদি হলো সমাপ্ত কিনা,
দেখে ফিরে তাই ;   রোচেনা অন্ন সবার আহার বিনা।
বৈশাখীর দিনে তপ্ত দুপুরে আসিয়াছে আশা ভরে
পল্লী ঘরেতে আতার আতুর দুমুঠা অন্ন তরে,
বিরস মুখেতে ফিরিছে তাহারা হয়তো বা দ্বারে দ্বারে
কিন্তু যখন আসিয়াছে তারা বাঁশরির গৃহ দ্বারে
বাশরি হয়তো ভাই বোনদের খাওয়ায় ধীর মনে ;
অপেক্ষায় রত তাদের দিয়াছে যাহা ছিল গৃহ কোণে।
নিজের বলিতে অন্ন সেদিন রয়নি কণিকা পড়ে
কাটালো সেদিন চাল ভাজা খেয়ে অনুরাগে প্রীতি ভরে।
রাগ করেনি কো কাহারও পড়ে যাহারা ফিরায়ে দিয়া
নিজেরা খাইল মৎস্য অন্ন ঘৃত ও সব্জি নিয়া ;
কেবল হয়েছে বিধির বিধানে ধিক্কারিয়া শান্ত,
কেঁদেছে তখন খুকু কি খোকন করিতে যায় ক্ষান্ত।
এমনি করেই পাড়ার সবার হয়েছে দিদি ও মাসী,
প্রতিদিন সাঁঝে তাহাদের নিয়ে বাজাতো বাঁশরি বাঁশি।
এমনি সেদিন বাঁশরি বাজায় অচিন সে কোন সুরে
এমন সময় শিশু ক্রন্দন শোনা গেল বহু দূরে ;
ছুটে গেল সেথা বাঁশিটিকে ফেলে—যেথা হতে এলো ভেসে,
বুকে চেপে ধরে শিশুটিকে নিয়ে হায় হায় করে শেষে।
মাটিতে বসিতে গিয়াছে যখন উদাস ব্যর্থ মনা
শুধু সে বাতাসে—মা—আর্ত্তনাদ গিয়াছে বারেক শোনা।

কুটিল সর্প যায়নিকো সরে ভুগনো অনেক দূরে
এসেছিল সে যে ফণা তুলে ছলে বাঁশিটির সুরে সুরে।
পল্লীবাসীরা জানে না তখনো কেন যে নীরব বাঁশি
শিশুটির খোজে এসেছে সবাই যত পাড়া প্রতিবাসী॥
আঁধার রাতেতে প্রদীপ হাতেতে বাহির হয়েছে সবে।
একটি প্রদীপ তাও গেল নিভে বাতাশের হু-হু রবে,
সেও যেন আজি কান্নার ছলে কি কথা জানাতে চাহে
পল্লীবাসীর মরমে যাইয়া আঘাত করিবে তাহে।
শিশুটি বক্ষে রহিয়াছে পড়া নীল দেহে ছুই জনা
সব স্পন্দন হয়েছে নীরব আরতো যাবে না শোনা—
বাঁশরির বাঁশি বারেকের তরে পল্লী মুখরা করি ;
নাম দিল তাই বাঁশরি পল্লী তাহারে মরমে স্মরি।
সেই হতে আজি চাষী গ্রামবাসী সব সাথীকে শোনায়,
মেটো পথ ধরি ইহারি পার্শ্বে যাহারা চলিয়া যায়,
গল্পে ছড়ায় অতি অপরূপ বাঁশরি পল্লী কথা
অবাক দৃষ্টি উৎসুক মনে শোনায় গ্রাম্য কথা।

২০শে পৌষ ১৩৫৭

মরীচিকা

এ মরুর মাঝে শুধু মরীচিকা,
তৃষিত পথিক ফিরেছে একাকী
বারে বারে সেতো ছুটেছে তথাপী ;
চিকিমিকি বেলা ছুটাছুটি খেলা
তবু অনর্গল বাহি-পর্ব ভেলা—
ফিরেছে একাকী প্রভাতে সাঁঝেতে
বাসনার যত রতন মাঝেতে।
বিফল হয়েছে গাঁথা যে মালিকা
ঝরেগেছে সেই মাধুরী মল্লিকা।
এ মরুম মাঝে শুধু মরীচিকা॥
জীবনে যখন দহন জ্বালার
সুতীব্র শিখার সে অগ্নি মালার

লেলিহান দীপে এ রক্তিম রাগে
বিদেহী হৃদয় পুড়িতে যে লাগে!
বিকল আশার মরীচিকা ঘুরে,
মরু-জীবনের প্রাণন্ত সুদূরে—
এসেছে যখন ব্যথিত জীবনে
দৃষ্টি বেচালিত বুঝেছে মননে!
তাই তো সৃজনে কোথা চন্দ্রনিকা
এ মরুর মাঝে শুধু মরীচিকা॥

২০শে মাঘ ১৩৫৭

পূর্ণিমা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা-নিশি সচ্ছ নীলাকাশ।
বসন্ত জাগ্রত আজি দিগন্ত ব্যাপিয়া
নিঃসীম নীলিমে মেলা অসীমের রেখা
বিষন্ন বিশ্বের মাছে হয়েছে সসীম।
মনে হয় পরানেতে বসন্তের বুঝি
এই প্রথম উদয়। কতদিন আগে
মনে হয় কিনা হয় সঠিক তো নয়,
অস্পষ্ট অচেনা যেন মেঘে ঢাকা ক্ষীণ
চন্দ্রমা আলোক প্রায়, থেকে থেকে জাগে
ভাবে ভোলা মনে মোর।
অতীত দিনের
কত স্বপ্নীল স্মৃতির কল্পনার নীলে
মিলেছে আজিকে আসি বসন্তের রাগে,
পরান পাপিয়া গাহে প্রেমার্ত্ত গীতিকা
ফাল্গুনী ফাগেতে রাঙা ঘোর মোহাবেশে।

ফাল্গুন ১৩৫৭

কতটুকু জানা

বিপুলা বিশ্বের সীমা কতটুকু জানি
ঘরে বসে করিয়াছি শুধু কানাকানি।
নিজের প্রকৃতি দেখি দিয়েছি ধিক্কার,

আজি বারংবার
অচেনা ধরণী বলে, মজি আপনায়
ভুলেছে সকল কিছু গতি অন্তরায়।
জানি না যে কত কিছু কোথায় কি আছে
বিপুলা এ পৃথিবীর কোন বন মাঝে
জ্ঞান ধন শক্তিময়ী যেথা সব লোক
ছড়ায়েছে ধরাধামে অমেয় আলোক।
নতুন আলোকে লাগে চোখেতে ধাঁধাঁনি
বিপুলা বিশ্বের মাঝে কতটুকু জানি।
শুদ্ধ-শান্ত মন নিয়ে ঘুরি দিকে দিকে
গতিশীল কর্মরত ব্যথিত পথিকে
ত্রস্ত করেছে আমার মন ব্যাকুলতা,
তাদের শত কর্মভার জানায়েছে দীনতা
সেতো আমারই :
আমি শুধু নিজ মনে জেনেছি নিজেরই
অপটু অমন এই আপনারে ভোলা
দেখে না যে আঁখি মেলি দ্বার আছে খোলা
যেতে হবে যেথা সেথা সত্য-শিবে মানি
বিপুলা বিশ্বেতে থাকি কতটুকু জানি।
উদাহ বাতাস চলে আর মেঘমালা,—
শিউলি মল্লিকা ভরা পারিজাত ডালা,
কার কথা কার গান কেবা বলে তায়
আনমনা আমি একা জানি নাকো হায়!
শুধু জানি আমি আছি আছে সুখ শোক
আছে জন্ম-জরা-মৃত্যু আছে বহু লোক,
তারা মানুষের জাতি আমাদের জ্ঞাতি।
বহু যুগ হতে আছি একত্রেই মাতি
কেহ জ্ঞানী কেহ গুণী কেহ হবে মানি
তবু বিপুলা বিশ্বের কতটুকু জানি।

৩রা ফাল্গুন ১৩৫৭

ভাই ভাই সব বাই

এক হাতে গড়িয়াছে বিশ্বের যত লোক
তারি মাঝে দিইয়াছে হাসা-কাঁদা সুখ-শোক
ভুল কথা ভেদাভেদ,—ভাই ভাই
সব্ বাই ॥

ঐ নিঃসীম নীলিমা মিলিয়াছে সবুজেতে
আর যেথা উদয়ীর এ পুবালীর মাঝেতে,
গড়িয়াছি যত কিছু,—আমরাই
সব্ বাই ।

বন আর উপবন এ নদী আর পবত
এই নিয়ে সীমারেখা আঁকিয়াছে এট্লাশ।
আমাদের উপরেতে একই এই নীলাকাশ,
ভুলে যাব সেকি হয়!—বলি তাই
ভাই ভাই
সব্ বাই ॥

ঘূর্ণীবাতের মতই সৃষ্টি লীলার চক্রে
শক্তির টানে পড়ে এসেছিল ঠিক্‌রে।
সেদিনের ধুলি-ধোঁয়া মিলে হলো বিশ্ব
আমাদের দিয়া সব হলো নিজে নিঃস্ব।
সব কথা ছেড়ে বল আজ তাই,
ভাই ভাই
সব্ বাই ॥

স্রষ্টার সৃষ্টি এক যেগো সবটাই
ভেদাভেদ কোথা পাবে নাই নাই
ভাই ভাই
সব্ বাই ॥

২২শে চৈত্র ১৩৫৭

কি গান গাব

দিন দেশেতে কি গান আছে গাব আমি !
বৈতরণীর পারে পথিক গেছে নামি
অস্তাচলের দূর সুদূরে—আঁধারিয়া
মন মোহিনী। আকুল হল ব্যর্থ হিয়া
ছুকূল গেল যে আলুলিত অন্ধকারে,
কালো মেয়ের নামল যেন চুপেসারে
কাজল কালো কেশরী রাশি।
বারেবারে
জীবনের ধুসর গোধূলিতে আপনারে
ফিরে চায় যে একান্ত করি সব মাঝে।
বিশ্বের দান যত পড়িয়া রহিয়াছে
তারই সাথে হউক লয় আজিকার
পসরা লয়ে আসা যাহার। সবাকার
ব্যর্থ দিনের ভার বাহন লাঘবিয়া
যখন এলো—আমি তখন আকুলিয়া
ফিরি মনের গোপন কোণে,—কামনার
কালিন্দী তটে চিত্র দেখি যে আপনার।
ভবের কূল সীমানা হ ন। নিত্য সাজে
অসীম অতি জানা না জানা তার মাঝে।
কেমন করে মন এ রাজে কেবা জানে,
কণ্ঠ আমার ভরবে কিবা গানে গানে।
আলো আঁধারি নামল সন্ধ্যা রূপায়ণে,
সৃষ্টি মাঝারে থাকলে পড়ে অকারণে,
সৃষ্টি ছাড়ার প্রয়াস জাগে। গোধূলিতে
শেষের কথা জাগে যখন,—উচ্ছ্বসিতে
কি গান গাব কি সুর রাগে কোন প্রাণে !
তারার দিকে তাকিয়ে তবু মুগ্ধ গানে
প্রেম জীবনের জ্যোতি যত লীলা মনে
মধুর সুরে আশায় সাধি তারি সনে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

মেঘে আমার কোন চিহ্ন নাই

উদাসী মেঘের উড়া পালে পালে
লাগেনি আমার রঙের-রেখা,
আসি বারে বারে তাপ-গৃহদ্বারে
ফিরে ফিরে যায় যে একা একা।
থাকে না থাকে না শত অনুরোধে
মায়া নাই বুঝি পথ তার রোধে
আমাদের তরে এতটুকু ক্রোধে ;- -
বরষা বরণে বারেক দেখা
আবার উদাসী পথে পথে যায়
লাগে না কো হায় রঙ ও রেখা।
মেঘলা পথিক পথ চিনে লয়
আঁধার আলোয় শূন্যলোকে,
দিক-বিদিকের রক্ত রাঙানো
অশ্রু জ্বালানো যে দীপালোকে।
গুমরি গুমরি উঠিছে বাজিয়া
মেঘ শত মালা সজল ঢালিয়া
গৃহ দ্বার সব রুদ্ধ করিয়া
ত্রস্ত করেছে নরের শোকে ;
সে দিকে মেঘের পরোয়ানা নেই
ছুটে চলে যায় শূন্যলোকে।
নামে ঘন ঘন বরষণ ধারা
মুখরা মাধুরী কি কল্লোলে
চমকি চমকি বিজুলী লতিকা
খেলে যায় মেঘ এ অঞ্চলে
স্তব্ধ দিঘির কালো কালি জলা
দাপা-দপি চাপি হলো চঞ্চলা,
পারিজাত হতে সমীরে সুরভি
আকাশে আকাশে সে হিল্লোলে ;
মনে নাই তার মন নাই কিছু
বিধির বিধুর কল্লোলে।

এসেছে আষাঢ়ে প্রথম দিবসে
যাবে উজ্জয়িনী এ পুরালয়ে
বিরহি প্রিয়ার বার্তা আনিতে
রেবা নদী তীরে যক্ষালয়ে।
আজিকার কবি সেদিনের কথা
ভাবে ভোলা মনে পায় কত ব্যথা
মেঘদূত হয়ে শিখে চপলতা
কবির বাসনা যে অপচয়ে
রহিল পড়িয়া ব্যথাতুর প্রাণে
যাবে না যুগের সে পুরালয়ে।
মন্দিরে মন্দিরে বাজে ঘন ঘোর
মেঘের পসরা যে সাথে সাথে
ক্রান্তি ধরিয়া যুগ যুগ হ'তে
যায় বহু দূরে রিক্ত হাতে।
কোথাও বৃষ্টি ভীষণা ঝড়
কোথাও পড়িয়া শুকানো খড় ;
মাথা নেই তার মাথা ব্যথা হবে
কিসের জন্যে দিনে ও রাতে
এসেছে যেমন যায় চলে একা
চিহ্ন বিহিনে সে সাথে সাথে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

দিদিমণির ঘাট

কুমারী মেয়ের সিঁথির মতই ফল্গু নদীর ধারা
গাজন গাঁয়ের মাঝের জমিনে ছুটছে অঝর ঝারা।
দুকূল ভরে যে কাশ পলাশের বনানীরে আলু-থালু,
দূর গগনের প্রান্ত সীমায় বিশ্ব যে হয়েছে ডালু
অস্তাচলের রক্তিমাভায় হাতটি বাড়ায়ে আসে
সিঁথির সীমায় সিঁদূর দেওয়ার নিত্যকালের আশে।
ডাক দিয়ে যায় ঘরের বধূরে সপ্তর্ষি সাধিনী
পল্লী বধূয়া গায় সুরে সুরে তারই কোন রাগিণী।

আঁধার তারকা সন্ধ্যা জ্বালায় দীপালী প্রদীপ মত.
ফল্গু নদীতে কিরণ ছড়ায়ে জলে কত শত শত।
এমন দিনের রূপকথা জাগে স্বপ্নের অংগনে
এমনি সেদিন গাজন গাঁয়ের রূপ ছিল রূপায়ণে।
সেদিনের সেই অতীত কাহিনী আজিকে শোনাই শোন
মনে হতে পারে এটা নিশ্চয় রূপকথা হবে কোন।
খাটি ঘটা কথা শোনাবার শুধু বাসনা যতেক ছিল
এ কাহিনী কথা বোধ হয় তবে তাহাই মিটায়ে নিল।
স্বপ্ন-লোকেতে আড়ি পেতে বসে এসো না, বারেক এসো
কল্পনাপালে-পেখম মেলিয়া উদাহ বাতাসে এসো।
চেয়ে দেখ সবে ফল্গুনদীর তীরের যে ঘাট খানি
ধাপে ধাপে গেছে উঠে পার পড়ে, পাথর বাধান মানি।
তাহার সমুখে রাঙা মাটি পথ গিয়াছে গাঁয়ের দিকে
যেই পথ রচে শত পদাবলী বধূয়ার কথা লিখে।
দক্ষিণ বামে ক্ষেত সারি ফেলি মেটো পথ ধরি চল
গ্রামের সীমানা মিলিবে গো তুমি গেলে পড়ে চঞ্চল।
যুথিকা বালিকা এ গাঁয়ের মেয়ে দিদিমণি নামে ডাকে
গাজন গাঁয়ের প্রতিটি মানুষ স্নেহের বাধনে তাকে।
পিতা হারা হয়ে মায়ের ক্রোড়েতে হল সাতটি বছরে ;
মায়ের এলো যে যাবাব পালাটি—চলে গেল সত্বরে।
অনাথিনী বালা বেদনা বিভলা গেল দুর গাঁয়ে চলে
যেথায় তাহার দিদির বাসাটি— গেল নিজ গাঁও ফেলে।
যে গাঁয়ে কেটেছে সাতটি বছর ভুলিবে তারে কেমনে !
মায়ার টানেতে আবার আসিতে হল তারই অংগনে।
পরের ঘরের বধূটি হইয়া ঘোমটা মাথায় দিয়া
এসেছে ফিরিয়া যুথি দিদিমণি নিজ কুলটি ফেলিয়া।
বধূয়ার সাজে এসেছে যদিও তবুও তারে সবাই
দিদিমণি ডাকে স্নেহের বাঁধনে প্রাণপণ নিঙ্‌রাই।
সে দিনের সেই যুই নামে ডাকা অতি শান্ত ছোট মেয়ে—
দেখেছ কি তুমি মায়ের সাথেতে ফিরেছে যখন নেয়ে ?
ঘরেতে তখন দুটি কি একটি রয়েছে ভিক্ষারী পড়া
দিয়াছে ভিক্ষা মায়ের আদেশে—এই নীতি বাঁধা ধরা।
মালতী মল্লিকা যুঁই শেফালিকা বেল রজনী গন্ধা
কত ধরণের মালিকা গাঁথিছে হয়েছে যখন সন্ধ্যা।

তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিবে দিইবে মালিকা গাঁথি
গায় কীর্ত্তন মন মাতাইয়া মিলিয়া যতেক সাথি।
কোন ঘরে যদি কারো প্রয়োজন নুন কিংবা তৈল ঘৃত
পেয়েছে অঢের বিনা দ্বিধায়—হয়নি তো লজ্জিত।
রোগ-বিকারের দিনে রাতে সে যে আহার নিদ্রা ভুলিয়া।
ফিরেছে সবার ঘরে ঘরে গিয়া রোগ শুশ্রূষা করিয়া।
এমনি ঘটনা ঘটেছে কত না কি বলিব বার বার
শুধু একদিন যাহা ঘটেছিল মনে হয় বলিবার।
বধুটির বেশে যুথিকা এসেছে সাজিটি লইয়া হাতে
শ্যামল শোভায় আসিত যেমন প্রতিদিন বিকালেতে।
আসিল আজিও ফল্গু নদীর সান বাঁধানোর ঘাটে
ছোট ছেলে মেয়ে ছুটে গেল কত—খেলিতে ছিল যে মাঠে
দিনের মধ্যে এই তো সময় চির প্রতীক্ষিত করে
রেখেছে তাদের স্নেহের আঁধার সাধের দিদির তরে।
দিদিমণি আসি চুম্বন করি কাহারে লইল ক্রোড়ে
কাহার বা করে দিইল গুজিয়া দুইটি ফুলের তোড়ে।
এমনি করিয়া দিদিমণি বলি ছুটে ছুটে আসে সবে
স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পরে তারা চির কৃতজ্ঞ রবে।
প্রীতির বচনে গল্প ছড়াতো ফুয়ারার মত ছোটে
হাসি হাসি সবে শিশু সাথী দল ভুমেতে পড়িয়া লোটে।
এদের মধ্যে মিণ্টু সবার হইতে অনেক ছোট
মিণ্টু যখন মা-হারা হইল, প্রাণে বড় লাগে চোট;
সে দিন হইতে মিণ্টু নিয়েছে দিদির সংগ রোজ
অনেক কষ্টে মানুষ করেছে না করে কখন রোশ।
প্রাণের ধনের বাড়া এ ধন—হয়েছে দিদির কাছে
তবুও সবাই একই ভাগের ভাগি হয়েই যে আছে।
সে দিন যখন মিণ্টু মোদের ঘাটের পারেতে বসে
আপনার মনে খেলতেছিল সে ফুলে জলে এক রাশে।
কখনো ভাসায় কখনো উঠায় এমনি করে কত না;
এমন সময় গিয়াছে শোনা যে, কাতর স্বরে—"ধরনা"!
সেদিন যুথিকা মিণ্টুর তরে গড়িতেছিল খেলনা
কেয়া পাতার নৌকা ভাসাবে করেছিল সে বাসনা।
হায় হায় করে উঠেছে সবাই যখন দেখেছে তারা
মিণ্টু গিয়াছে জলেতে ভাসিয়া—দিদিও চলেছে ত্বরা।

হাতেতে দিদির রয়েছে তখনো কেয়া-পাতা ভেলা খানি
ধরেও ধরিতে পারিল না একা দিদিমণি অভিমানি।
অতল গাঙেতে তলিয়ে গেল যে প্রিয় অতি দিদিমণি!
নদীর ঘাটের ওপারে তখন গোধুলির দিনমণি।
এই ঘাট আছে বিজড়িত কত অতীত কাহিনী লয়ে,
প্রথম যেদিন যুথিকার মাও এলো বর বধূ হয়ে
সেদিন তাদের খেয়া তরী এসে লেগেছিল এই ঘাটে;
বিয়ের বাঁশিতে মুখরা করিল সকল বিবাগী মাঠে।
যুথিকাও এসে নামিল প্রথম বর বধূ তুজনায় --
সেই ঘাটে আজি জীবনের শিখা মিলাইল অসীমায়।
সেই হতে আজি যত গ্রামবাসী দিদিমণি ঘাট বলে;
পবথ করিতে যেতে চাও যদি যেও গো তথায় চলে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

অন্তর্মুখী

মনের গোপন কোণে নিভৃতে পরশ লাগে।
জাগে কি না জাগে
অন্তর আত্মা—
কে জানে গোপন সত্তা!
বাহিরের রূপ রঙ্
ভ্রূ-ভঙ্গিমা আর ঢঙ্,
মদিরা রসেতে মন মত্তা,
বিলীন হয়েছে নিজ সত্তা।
অধরের এতটুকু হাসি,
ফিরে ফিরে আসি
যাচাই করেছি বারে বারে
আদরে অনাদরে।
শুধু এতটুকু রেশ
উঠিতে না উঠিতে হয়েছে নিঃশেষ,
ধুলি লিপ্ত
মালিন্য সিক্ত
এ অধরে
অনাদরে।

নিমেষে সব হয়ে আসে স্তব্ধ,
বাহির দুয়ার হলে বন্ধ,
দৃষ্টি ফিরে অন্তর্মুখে।
দুঃখে আর সুখে
বিরহে মিলনে
দ্বিবর্ণ রঞ্জিত পট ক্ষণে ক্ষণে
নিরব ইংগিতে
আজ আত্মারে জানায় চিনিতে';
বারংবার বলে সে—
"মোহের জালে ভালবেসে
দূরের প্রাণীকে
চিনবে ক্ষণিকে
এ বড় দুঃসাহস
ভেবে দেখ দেখি পেয়েছ কি সত্যের পরশ ?
সে তো রুগ্ন
সে তো জীর্ণ
সে তো ধ্বংসের অবশেষ
রূপ রঙে আঁখি অনিমেষ।
চিনে নিয়ো আজি তাই চুপে চুপে
জীবন সত্য-স্বরূপে।"

১১ই আষাঢ় ১৩৫৮

ছলনা

অনেকে এসেছে আমার কাছে
নানান কাজে,
দুদিনের হেঁয়ালিতে
মাতিয়ে দিতে।
লেগেছে তাদের চোখে
আমার জীবন কবিতা
রাতের বনিতার যেন ভনিতা।
নেচেছে গেয়েছে কলকণ্ঠ কাকলিতে,
মুখরা করেছে পৃথিবীতে

সপ্ত-স্বরের রাগালাপি আড়ম্বরে
এ জীবন-জাহ্নবী ভরে।
নিয়েছে অঞ্জলি ভরি ভরি
জোয়ার জাগিলে তোড়ি-খোড়ি,—
জলেতে নামেনি কখনো তারা
ঘাটের ধাপি গুলো করে সারা !
দিনে দিনে আছে শুধু জোয়ারের প্রতীক্ষায়
অর্বাচীন আকাঙ্খায়।
তাদের শত কাঙ্খিত স্তরিভূত স্তূপ
অচেনা অপরূপ,
তোমার আমার আর সকলের
গভীর হৃদয়ের
আশেপাশে বেড়ি বেধে
উঠে যেন আগাছা বিড়াট উদ্ভিদে।
শেষ হলে রূপ রস গন্ধ গান
তারাও তেমনি চলে যান,
নতুন রসের রক্তিমায়
চলেছে যেথায়
বারংবার
অলক্ষ্যে ফোটাবার
শুধু ব্যর্থ প্রয়াস।
ভিড় জমিয়াছে যেথায় মানুষের বসবাস।
পুরোন স্মৃতি যদি বা জোটে
আমল দেয়নি মোটে।
ফিরেছে দিবা নিশি দিনে দিনে
সবার সৃষ্টি রসেতে মিশে
নিয়েছে শুষে,
আগুন লাগিয়ে ঝরা তুষে।
আষাঢ়ের আকাশে আকাশে
জলধরা মেঘমালা ভিড় করে আসে,
আকাশে ভাসায় তার
লিপির লেখনী ভার,
মাটির পৃথিবীতে চলে
অনর্গলে

অভিসার পথে মানুষের মন
উদাসীন আনমন।
জলঢালা ধবল মেঘের স্তূপে
নতুন প্রকৃতি ধারণ করেছে ঋতু-রূপে।
মুখরা-মৌসুমী শেষ হলে পরে
আর কই মেঘের পসলা চোখে পড়ে।
তারাও এসেছে আমার মাঝে
নিত্য নতুন সাজে
অভীপ্সু মন নিয়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে
জীবন খনির মর্ম মূলে।
হেলে দুলে
সব জানা শেষ করে
স্রোতের ত্বরায় গেছে তোড়ে
আমার ঘাটের পসরা নিয়ে
অন্য ঘাটে,—দিন কতকে মাতিয়ে দিয়ে
তারা শুধু সুযোগের প্রত্যাশী
তোমাতে আমাতে আসি
রচনা করেছে জীবন চয়নিকা,
ধসে গেছে একদিন তাদের সে ক্ষণিকা।
চলবে কেমন করি
শুধু পরের ধনে পোদ্দারি !

৩০শে আষাঢ় ১৩৫৮

ফুলরা

জানি ফুল ফুটেছিল ধরণীর বুকে
মন-মোহিনী মায়ার অপরূপ রূপে।
ঘেরি দশ-দিকপালে
ইন্দ্র-ধনু বর্ণ জালে,
জানি ফুল ফুটেছিল ধরণীর বুকে ;
এলো শ্যামলের দেশে
রঙ-বিহারীর বেশে

রূপ রঙ ছড়াবার অভিলাষ সুখে
জানি ফুল ফুটেছিল ধরণীর বুকে।
রঙের ছোঁয়াচ পেয়ে মেতেছে মানুষ
আবার কল্পলতায় গড়েছে ফানুস।
এই তো করেছে সৃষ্টি
ফুকো সভ্যতা ও কৃষ্টি,
জানি, রঙের ছোঁয়াচে মেতেছে মানুষ।
শুধু ফাঁকা ফুকো নিয়ে
নাচা নাচি করি গিয়ে
বন-নীলিমার শেষে—সীমানা সম্মুখে,
জানি ফুল ফুটেছিল ধরণীর বুকে।
নব যৌবন জোয়ারে ধোয়াল ধরিত্রী
বনে বনে মধু-ভারে জাগিছে গায়ত্রী।
দিকে দিকে এ ফুল্লরা
উদয়ীত উন্মুখরা,
নব যৌবন জোয়ারে ধোয়াল ধরিত্রী।
ফাঁকামিতে ভরা থাক,
তারি মাঝে অনুরাগ,
তবু জানি মানুষের সব সুখে দুঃখে;
জানি ফুল ফুটেছিল ধরণীর বুকে।

৩০শে ভাদ্র ১৩৫৮

মধু-কবি

যুগ-যুগান্তের সৃষ্টি সুধারাশি মনন সৃজনী বলে
ধরণী ধারণ সতত করিঁছে দুগ্ধ-স্রোত রূপী জলে;
দুকূল প্লাবনী পেলব কাহিনী অজানা লিখন রেখা
প্রকৃতি পূজারী বুঝেছি কেবলি কি তার মোহিনী লেখা।
কত না কাহিনী কবিতা-কাকলি কুল-কুলিত বাহিনী
জটাজুটা ধারি দেবের শিয়র পর্শিত উৎসারিণী।
দিশি দিক ব্যাপী স্রোত ধরা রূপী বিলসিত জটাজাল
পঞ্চ-সিন্ধুনদ গংগা ব্রহ্মপুত্র শ্যামা-ভারত তমাল।

সেই নদী ধারা ছুর্বার স্রোতেই সাগরদাঁড়ির পারে।
পারি জমাইয়া প্রচারিছে যশ যশোহর মহিমারে।
কীর্তি তাহারই অবিনাশী রবে চির ভারতের ভূমে
ধন্য হইল যে কবিতা বিভূতি হেথা কপোতাক্ষে চুমে।
যে দেখেছে তার শোভা রূপায়ণ মজিছে কাব্য কুজনে।
কত না অকবি মজিছে কবির রস-রূপের বর্ষনে।
মধু-কবি এই কবি নিকেতনে লভিছে এ জন্ম-জ্ঞানে—
কবি পুত্রেরই ধাত্রী ধরা এযে কবি কুলপতি মানে।
মহাভারতের কবিতা কাকলি দিয়াছে রসের ভাষা।
রামায়ণ কথা ছন্দে ও বরণে মিটাল মধুর আশা।

অমর কবিতা অজেয় কবি যে সৃষ্টির সুধা শৌরভে
ইতিহাস গাথা-শ্রীমধুসূদন-নাম লিখে সগৌরবে ;
সার্থক হইল অলেখা পাতার যত সুবর্ণ সম্ভারে
জাতির ললাটে যশ-জয়-টিকা যে পরশিছে ছন্দারে।
পয়ার প্লাবিত বাঙ্‌লার ভূমে নব-জীবনের রসে
অমিত্রা ছন্দায় সজীব সুরভি পূর্ণ করিয়াছে যশে ;
শ্রেষ্ঠ যে কবির জয়ের মালিকা পড়িল সে গল-লগ্নে
এ বঙ্গ ভাষার সৃজনী মহিমা দ্যুতি-দীপ্ত বিভা মগ্নে।
ত্রিধারা মিলিছে মধু কবিতার ত্রিবেণীরই সঙ্গমে
বীরের বিপ্লবে প্রেম-ভাষা স্রোত আনিল কাব্য-জঙ্গমে

বাঙালী হিয়ারে অমৃত পীযূষে—মাতৃভূমিরই সনে
প্রণতির প্রাণ গড়িছে স্বদেশী মেঘনাদ কাব্যায়ণে।
বিপ্লববাদীর বিদ্যুৎ ছটাই ঝলকে ঝলকে ওঠে
ভীরু রামানুজ অস্ত্রহীন যোধে তনু মন লয়ে ছোটে।
স্বাদেশীকতার মহাগুণ,গান বাঙ্গালী মাধবী মনে
মধুসূদনের কাব্য কথাতেই প্রথম কানেতে শোনে !
প্রেমেরই পত্র কবিতা লিখিছে যত বীরাঙ্গনা বালা
শাশ্বত নারীর মানস মহিমা ছন্দ-সূত্রে গাঁথা মালা।
অমর লিখনে শ্রীমধুসূদন বাঙালীর হিয়া মাঝে
নিজের মাধুরী মঞ্জরী মধুর ভরিয়া পরান রাজে।

ব্রজবাসী যত মানস মুরলী বাজাইয়া বেণু বনে
ডাকিয়া ডাকিয়া চলিল গাহিয়া মন লোভা হতে মনে।
সে মধুর সুরে রাধিকারমণে সখি সখার বন্ধনে
রচিল আবার ভক্তিপূত অর্ঘ্য নব ভাবের সৃজনে।
কি মধুর রসে মধুময় গাহে এ মাইকেল খৃষ্টানী
বৈষ্ণব কবিরা যে নতি স্বীকৃতি করিবে বলিয়া জ্ঞানী।
তিল তিল করি যতনে সংগ্রহে তিলোত্তমা সু-সুন্দরী
ধরণীর বুকে অপ্সরার রূপে সৃষ্টির মধু-মঞ্জরী ;
অমিতা ছন্দেতে মধুর লেখনে সেও তো পড়েনি বাকি
যুগ যুগ ধরি মত্তা মদিরা পিইবে পরান পাখি।

কত না যে ছন্দা অতি মন্দা ক্রান্তা চতুর্দশীরই ছাঁদে
মধু-কবি রচে বন্দনা গীতিকা ভক্তিরস পরমাদে।
রসের রসনা ভাবের ভাবনা ছন্দ-যতি-অলঙ্কারে
সে নন্দন ভ্রমি ছন্দারই স্বামী কবিই কেবল পারে।
তারি সুর লাগি কবিকুল জাগে সে নূতন যাত্রা পথে
নূতন ভোরের আশার আলোক এসেছে সোনার রথে।
তমিস্র রাতির তিমির বিদারী উদয়ী উষার কালে
মহাকবি মধু কবিতা পাথেয় দিইল যুগের ভালে
প্রাণ পেল পথি দিশে হারা পথে পথের নিশানা পেয়ে
কত কবি মধু জন্ম যে লভিল বাঙলার মাটি ছেয়ে।

১লা পৌষ ১৩৫৮

আখর

কাজের কাজি
আমি যে আজি
চলেছি বুনে
কথার জাল।
দিনের বেলা
রাতের বেলা,
নেই কো কোন
রাতের কাল।

জীবন আছে
দেহের মাঝে
যত না দিন
চলবে চাল
হবে না জেনো
ত'দিন গোনো
নিচিৎ বলি
কি বে-সামাল।

স্রোতের তোরে
তরীর পরে
উঠ্‌লে জেনো
ধরিও হাল।
নইলে পরে
পড়বে জলে
যেমন পড়ে
গাছের তাল

কথার কথা
তাইতো গাথা
বোঝাই পাতা—
ফুলের থাল।
সবাই মিলে
কথার নীলে
আপন নভে
উড়ায় পাল।

চলছে তরী
বিজয় করি
প্রেমের প্রাণে
চড়ার ঢাল
আমিও আজি
সাজাই সাজি
সবার সাথে
রাখিয়া তাল।

জীবনে সেথা
আমার লেখা
ইতির কবে
ঘটবে কাল।
উদাস প্রাণে
সুদূর পানে
তাকিয়ে ভাবি
কি আশা-জাল॥

১৩ই পৌষ ১৩৫৮

ভীরু বাসনা

আমার এ জীবন ঘেরি
বিষাদের ছায়া-উত্তরীয় হেরি।
চলে যায় দুরান্তে,
সন্ধ্যায় দিনান্তে—
গোধূলির ফিকে রক্তিমা;
বিবশ বাসনার পুঞ্জিত গরিমা
করে যে বিলীন।
সেই দিন
অতীতের মনে পড়ে কথা জমা
কত স্বপ্নময় রাত্রির সুষমা।
গড়েছিল মানস-মহিমা
আপন যাদু-মন্ত্রে পূর্ণ-প্রতিমা
স্বপ্ন সৌধ মাঝে,—
যেথা জ্যোতির্লোক বিরাজে।
সেই দ্যুতি জ্যোতি,
বিচ্ছুরিত আজি সর্ব-জগতি;
মনে মোর সেই ছিল
মাতনের নভে আভা-নীল।

তাই কবে অনুপম আশা
আমার অনন্তে বেঁধেছিল বাসা

তারি তড়িৎ প্রভা স্বপ্নলোকে
জাগে ক্ষণে ক্ষণে সান্ত্বনা-শোকে।
ভাসিছে জীবন-ধন ভয়ার্ত নরকে,
অথবা চলোর্মি সূর্য-সৌধপুরে।

দূরে দূরে
আমার আনমনা পরান পাখি
দিয়েছে পাড়ি—সুখে থাকি
আপন এ কোটর মাঝে,
তাই বুঝি বজ্র-বাজে
যাত্রার পথে এসে?
ভীরু বাসনায় অবশেষে
বিবশ করি দিতে চায়
আনার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়।

১৫ই পৌষ ১৩৫৮

অরুণিমা

উদায়ী উষার অরুণ কালে
চন্দন টিপ এঁকে দিলে তুমি ভালে
রক্ত-রাঙান আলিম্পনে
পূবালী পারের সোনালী স্বপ্নে
নীলজ নভে আধ-আলো ঝল-মলে
অরুণাভ ধরা নতুন রাগিনী রাগে
জাগে কি না জাগে
মোর সুপ্তোত্থিত অন্তর-আত্মনে
এ অভিসার অঙ্গনে।
পশু পাখি আর মানুষের বসতি সমাজ
ছিড়ে ফেলে তার তমসার সাজ
নতুন যুগের ভূতি-ভোরে।
আলোরই ঝরণা তোড়ে
তমসা রাতির গিয়েছে ওড়না উড়ে

প্রকাশ-পিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে
সুর খুঁজে ফিরে অন্তর অঙ্গনে।
তুমি কি দেখেছ চেয়ে
ছলনাময়ী ও শ্যামলী মেয়ে,
তোমারই দুয়ারে এসে
হাত-ছানি দিয়ে ফিরিবে যে সে
অভিসার অঙ্গনে ;
এ অন্তরে আলিঙ্গনে।

মাঘ ১৩৫৮

অজানা সন্ধানে

অজানিত পথ
অগণিত দিন
অকূল সমুদ্রে পাড়ি
চলে নিশিদিন।
ক্লান্ত শ্রান্ত শ্রমে ক্ষীণ
শেষ হয়ে আসে
সব আশা ভোর
সাধনা স্বপ্ন মোর।
কুহক স্বপ্নীল
ব্যর্থ হয়েছে জীবনে যার
খুজি তারি ছন্দ-মিল
মোর জীবনের প্রতিপদে।
পথে বা বিপথে
চলিয়াছি অনর্গল
কিসের সন্ধানে
মোরা সন্ধানীর দল।
শুধু চলা···এগিয়ে চলা,
সমুখে—সন্ধানে
ধুসর পথের পারে ;
আর তৃণ শ্যামলীমার

রূপ-রস যত রাগ
গন্ধ গান মধুময়।
সে যে সঞ্চয়-সম্পদ—
শীতের আমেজ মেশা,
বসন্ত শারদ
অথবা গ্রীষ্মের উষ্ণতা

১১ই ফাল্গুন ১৩৫৮

সবিতা কে কবিতা

আঁধার ঘুমের রাত্রিরে ভরি
জপ তপস্যা যে আমরা করি
তোমার উদয়ী রূপ লীলার।
উষার কালের স্বর্ণ-শিলার
দোর খুলিবার স্বপন দেখি,
স্মরণ পথের আখর লেখি;
তোমার প্রতিমা তাইতো জাগে
রাত্রিরে ভরিয়া স্বপন রাগে।
তোমায় যে আঁখি দেখতে নারে
মন যে আমার তাই তো বারে
সূর্যি পরশের—আশার ছলে
নয়ন ভরিয়া, এ ধরাতলে
দেখতে যে চাহে। আঁধার ঘন
তিমিরে করিয়া জরা ও জীর্ণ
তোমার প্রকাশ এ বিশ্ব ব্যাপী
আমরা সদাই যে সূর্যিমুখী।
উদয়ী উষার অরুণ-আলো
জাগো গো আবরি রাতের কালো।
আমরা সবাই আঁধারে মরি
ঘুম ভাঙা রাত্রি-চয়ন করি,
দীপ্ত এ বিভার সূর্যের শিখা
স্মরণ-সৃজনে উদয় লিখা;—

হে পূষণ, আজি পরান পাখি
ছুট দিতে চায় তোমার লাগি।
স্বপন দুয়ার তাই তো আজি
খুলতে চাই যে এ রাত্রি রাজি ;
দিগ্‌ বিদিকের আঁধার পথে
উজল আলোর সোনার রথে
স্বপন রাতেরে সফল করে
এসো প্রেমিকা গো আমার দো
সবিতা তোমার রূপের প্রেমি
পাঠালুম মোর কবিতা-লিপি।

ফাল্গুন ১৩৫

সাঙ্গ

মিলিয়ে গেলে হাসির রেখা,
ফুরিয়ে যায় প্রেমের লেখা।

তখন শুধু জীবন-যাত্রা
ধূলি ও ধোঁয়া অধিক মাত্রা
দিন কতকে দিন গণনা
ভাটার টানে এই তো সেখা।
মিলিয়ে গেলে হাসির রেখা
ফুরিয়ে যাবে প্রেমের লেখা॥
তাই তো আজি না তরা তরী
রয়েছে গাঙে ঝিমিয়ে পড়ি ,
প্রেমের খেলা পরান খানি
নিত্য-নতুন রূপের-বাণী
কি তাহাদের বহন করে
জানবে—না গো সে জানবে না।
মিলিয়ে গেছে হাসির রেখা
ফুরিয়ে গেছে প্রেমের লেখা॥
সুখ ও দুঃখে পরান ভেলা
পার হয় যে জগৎ-মেলা,

আজকে সেথা কিসের লাগি
পায় না হাসি যে ভিক্ষা মাগি ?
দিক-বিদিকে পরান পাখি,

ভুল করে যে উড়তে সেথা !
মিলিয়ে গেলে হাসির রেখা
ফুরিয়ে যাবে প্রেমের লেখা ॥
জাগলো যবে ঠোটের ফাকে
মৃদুল হাসি মধুর রাগে,

প্রেম-পরানে সবার তরে,
মনন আশা আপন করে,
কাজল কালো ছায়ায় শেষে

ফুরিয়ে গেল সকল দেখা।
মিলিয়ে গেলে হাসির রেখা
ফুবিয়ে যাবে প্রেমের লেখা ॥

ঃশে ফাল্গুন ১৩৫৮